শ্রমিক শ্রেণি এখন

৪

সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়
প্রহেলী ধর চৌধুরী
শত্রুঘ্ন কাহার
প্রজ্ঞাপারমিতা দত্ত রায়চৌধুরী
নব দত্ত
সঞ্চলিতা ভট্টাচার্য
প্রসেনজিৎ মুখোপাধ্যায়

নাগরিক মঞ্চ

শ্রমিক শ্রেণি এখন ৪

SHRAMIK SHRENI EKHON 4

প্রথম প্রকাশ

কলকাতা বইমেলা, জানুয়ারি, ২০২৪

প্রকাশক

নাগরিক মঞ্চের পক্ষে পবন মুখোপাধ্যায় কর্তৃক

১৩৪ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র রোড কলকাতা ৭০০০৮৫ থেকে প্রকাশিত

মোবাইল নম্বর: ৯৮৩১১৭২০৬০

ইমেল: nagarikmancha@gmail.com

ওয়েবসাইট: www.nagarikmancha.org

প্রচ্ছদ অলংকরণ ও বিন্যাস

স্বপন দাস

মুদ্রণ

গ্রাফিক প্রিন্ট অ্যান্ড পাবলিসিটি, ৩ এ মানিকতলা ইন্ডাসট্রিয়াল এস্টেট,

কলকাতা ৭০০০৫৪

মূল্য: ৮০ টাকা

চটকল শ্রমিক : এখন

শত্রুঘ্ন কাহার

করোনা মহামারির দরুন রাতারাতি কৃষি বিলের পাশাপাশি চারটি শ্রম কোড যথা- মজুরি সংক্রান্ত কোড, ২০১৯; শিল্প সম্পর্ক কোড, ২০২০; সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত কোড, ২০২০ এবং পেশাগত নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য এবং কাজের শর্তাবলী কোড, ২০২০ সরকার লাগু করে। সংগঠিত কৃষক আন্দোলনের চাপে কৃষি বিল প্রত্যাহার করতে মোদী সরকার বাধ্য হলেও, শ্রম কোডের ক্ষেত্রে তেমন কোন সংগঠিত প্রতিবাদ না হওয়ায় শ্রম কোড বহাল রাখতে সরকারের তেমন কোন সমস্যা হয়নি। অথচ এই ৪টি শ্রম কোডই শ্রমজীবীদের জীবনকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করবে। বেশিরভাগ লেখায় শ্রমিকদের বিশেষত চটকল শ্রমিকদের অর্থনৈতিক জীবন, সামাজিক নিরাপত্তা তথা শিল্পে মালিক শ্রমিক সম্পর্ক ইত্যাদি সম্পর্কে আলোকপাত করা হলেও, তাদের জীবনে পেশাগত রোগ, স্বাস্থ্য পরিষেবা ও কাজের পরিবেশ নিয়ে তেমন কোন আলোচনা লক্ষ্য করা যায় না। তাই এই প্রবন্ধে মূলত চটকল শ্রমজীবীদের জীবনে উপেক্ষিত এই বিশেষ দিকটির উপর আলোকপাত করার চেষ্টা করব, চটকলের কিছু বাস্তব ঘটনাকে সামনে রেখে।

৭ই ফেব্রুয়ারী ২০২৩, গৌরীশংকর জুট মিলে নাইট শিফটে কাজে যোগ দেয় পরবেশ সিং। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার বুকে ব্যথা

ওঠে, যা সর্দারকে জানালে সর্দার তাকে কাজ ছেড়ে বাড়ি ফিরে যেতে বলে। বেশি রাত হয়ে যাওয়ায় পরবেশ সেখানেই মেশিনের পাশে চটের বস্তা বিছিয়ে আরাম করার জন্য শুয়ে পড়ে। ভোর বেলা তাঁর সহকর্মীরা তাঁকে আওয়াজ দিলে কোনও সাড়া পাওয়া যায় না, পরে তারা বুঝতে পারে পরবেশের ঘুম আর ভাঙবে না। মিল কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানালে তড়িঘড়ি তারা পরবেশ-এর দেহ দেশের বাড়ি পাঠানোর জন্য একটি অ্যাম্বুলেন্স এর ব্যবস্থা করে দেয়।[১] শাসক দলের এক ট্রেড ইউনিয়ন নেতার কাছে বিষয়টি সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি জানান, তাঁকে বাড়ি চলে যেতে বলা হয়েছিল, সে মিলেই আরাম করতে শুরু করে এবং মারা যায় তাতে মালিকের কি দোষ? আমরা তাঁর পরিবারকে কিছু টাকা দেওয়ার জন্য মালিকের কাছে প্রস্তাব রেখেছি।[২]

ঠিক ৬ মাস পর এল্যায়েন্স জুট মিলে ৪ঠা আগষ্ট সকাল ৮ টার সময় মিলে কাজ করতে আসা বিবেক কুমার রাজভর-এর পেটে ব্যথা শুরু হয়। সঙ্গী সাথীরা তাকে মিলের ডিস্পেন্সারিতে গিয়ে ওষুধ খেয়ে রেস্ট করতে বলে। সে ডিস্পেন্সারিতে গেলে তাকে একটা ওষুধ দেওয়া হয় সঙ্গে একটা ইনজেকশন। কিছুক্ষণের মধ্যে ব্যথা বেড়ে যায়, মিলের ডাক্তার হাসপাতাল যেতে বলে, কিন্তু মিলে অ্যাম্বুলেন্স না থাকার কারণে তাঁকে প্রতীক্ষা করতে হয়। প্রায় এক ঘণ্টার পর পরিস্থিতি আরও খারাপ হলে অগত্যা মিলের বড় সাহেবদের গাড়িতে তাঁকে হাসপাতাল নিয়ে যাওয়া হয়। গোলঘর হাসপাতাল পৌঁছাতে পৌঁছাতে সেই শ্রমিকের মৃত্যু হয়। পরে তাঁর শবদেহকে মিলে ফিরিয়ে আনলে, দেখা যায় মিলের কর্তৃপক্ষ মিল

থেকে উধাও হয়ে পড়েছেন। অনেকক্ষণ তাঁর শবদেহকে সামনে রেখে বিক্ষোভ দেখানো হয়।[৩] একজন শ্রমিক মিল ডিস্পেন্সারির অব্যবস্থা নিয়ে অভিযোগ করে। তিনি জানান, এখন মিলে উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ডাক্তার থাকে না, ডিস্পেন্সারি থেকে সব রোগের জন্য একটি গ্যাসের ওষুধ ও একটি ইঞ্জেকশন দেওয়ার চল আছে। মাথা ব্যথা, পেট ব্যথা, বুকে ব্যথা, কোথাও আঘাত লাগলে সেই একই ওষুধ দিয়ে দেওয়ার প্রয়াস চলে। এত বড় মিলে যেখানে প্রায় ২০০০ থেকে ৩০০০ শ্রমিক কাজ করে, সেখানে মিলের নিজস্ব কোন অ্যাম্বুলেন্স নেই! ফলে গুরুতর কোনও আঘাত ঘটলে শ্রমিকদের চেয়ে থাকতে হয় বাইরে থেকে সাহায্য আসার উপর। অথচ সরকারী নিয়ম অনুসারে বৃহত্তর সংগঠিত শিল্পে এই সমস্ত উপকরণ থাকা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু বাস্তব চিত্র ঠিক এর উল্টো।

শুধু বিবেক রাজভর বা পরবেশ সিং নয়, এই ধরনের ঘটনা মিলের নিত্যদিনের ঘটনায় পরিণত হয়েছে। এক শ্রমিকের ভাষায়, 'হমলোক কা জীবন কা কই মোল নাহি হ্যা, মিল কে অন্দর অগর কাল মর জায়ে তো, হামারা পরিবার কা ক্যা হোগা?' শ্রমিকদের মধ্যে অহরহ এই প্রশ্ন ঘুরে বেড়াচ্ছে। বস্তুত চটকলের দৈন্য অবস্থার সাথে সাথে মিল শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাও প্রায় ভেঙ্গে পড়েছে বললে বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না। ব্রিটিশ আমলেও তাদের স্বাস্থ্য নিয়ে এতটা উদাসীনতা লক্ষ্য করা যায়নি। স্বাধীনতার পর পর সেই ব্যবস্থা একটি পাকাপোক্ত রূপ নিয়েছিল। মিলের অভ্যন্তরে ডিস্পেন্সারির পাশাপাশি দক্ষ ডাক্তারের উপস্থিতিও বেশ লক্ষ্য করা যেত। গুরুতর রোগ বা দুর্ঘটনার জন্য ছিল ই.এস.আই. সুবিধাযুক্ত

বেশ কিছু নামকরা হাসপাতাল, যেখানে অতি যত্নসহকারে শ্রমিকদের বা তাদের পরিবারের রোগ নিরাময়ের চেষ্টা করা হত। কিন্তু বাম আমলের শেষ দিক থেকে বিশেষত শেষ দেড় দশকে পরিস্থিতির ব্যাপক অবনতি লক্ষ্য করা যায়।

বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের মূল উদ্দেশ্যই হল সরকারী দায়বদ্ধতা যত বেশি কম করা যায় তত ভালো। তারই উত্তম নিদর্শন হল শ্রমকোড ২০২০। করোনা কালে কৃষি বিলের পাশাপাশি রাতারাতি শ্রমকোডও পাশ করা হয়, যেখানে বলা হয় এই নতুন আইন শ্রমিকদের মজুরি, শিল্প সম্পর্ক, শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা তথা পেশাগত সুরক্ষা প্রদান করবে। কিন্তু পূর্বে এ সংক্রান্ত ৪৪টি শ্রম আইন ছিল যেগুলিকে তুলে দিয়ে নতুন এই চারটি শ্রমকোড তৈরি করা হয়। প্রশ্ন হল কেন? মূলত পূর্বের আইনের সাথে বর্তমান আইনের তুলনামূলক আলোচনা করলেই বোঝা যাবে সরকার কেন এই আইনগুলি দ্রুত প্রয়োগ করতে তৎপর। বর্তমান প্রবন্ধে শুধুমাত্র শ্রমিকদের পেশাগত সুরক্ষা সম্পর্কিত শ্রমকোড ও শ্রমিকদের উপর তার প্রভাব অনুধাবনের মধ্য দিয়ে চটকলের শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত করুণ পরিস্থিতির কারণ বোঝার চেষ্টা করব।

মূলত *দ্য ফ্যাক্টরি অ্যাক্ট ১৯৪৮, দ্য মাইন অ্যাক্ট ১৯৫২, দ্য ডক ওয়ার্কস অ্যাক্ট ১৯৮৬, দ্য বিল্ডিং এন্ড আদ্যার কন্সট্রাকশন ওয়ার্কস অ্যাক্ট ১৯৯৬, দ্য প্লান্টেশন লেবার অ্যাক্ট ১৯৫১, দ্য কন্ট্রাক্ট লেবার অ্যাক্ট ১৯৭০, দ্য ইন্টার স্টেট মাইগ্রেশন ওয়ার্কমেন অ্যাক্ট ১৯৭৯, দ্য ওয়ার্কিং জার্নালিস্ট অ্যান্ড আদ্যার নিউজ পেপার এমপ্লয়ি অ্যান্ড মিস্লেনিয়াস প্রভিসন্স অ্যাক্ট ১৯৫৫* এর সমান্বিত রূপ হল

বর্তমান *দ্য অকুপেশনাল সেফটি, হেলথ অ্যান্ড ওয়ার্কিং কন্ডিশন কোড ২০২০* বা পেশাগত সুরক্ষা, স্বাস্থ্য ও কাজের পরিবেশ সংক্রান্ত কোড। অর্থাৎ শিল্প বিশেষে আলাদা কোনও নীতি নয় বরং লঘু, মধ্যম তথা ভারী সকল শিল্পের জন্য সম্মিলিত ভাবেই এই আইন তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু আমরা আমাদের আলোচনা মূলত ভারী শিল্পের জন্য প্রযোজ্য আইনের মধ্যেই সীমিত রাখব এবং পুরনো আইনের সাথে তার তুলনামূলক আলোচনা করব।[৪]

চটকলগুলিতে যে আইনগুলি প্রযোজ্য হতে পারে সেগুলি হল -

১. পুরোনো কোড অনুসারে ছোট খাটো সব ধরনের দুর্ঘটনা, আহত ও মৃত ব্যক্তির সংখ্যা জানানো ও শিল্প সংস্থার চত্বরে নোটিশ বোর্ডে এই সংখ্যা ঘোষণা করার ও সরকারি কর্তৃপক্ষকে জানানোর আইন ছিল। বর্তমান আইনে দুর্ঘটনায় সেখানে মৃত্যু হয়েছে ও এমন শারীরিক আঘাতের ঘটনা ঘটেছে যার ফলে আহত ব্যক্তি ৪৮ ঘন্টা বা তার বেশি কাজ করতে সক্ষম হয়নি- শুধু সেক্ষেত্রে জানালেই হবে। কিন্তু অভিজ্ঞতা বলছে চট শিল্পে এর কোন ব্যবহারিক প্রয়োগই নেই। উপরের ঘটনার ক্ষেত্রেও দেখা যায় শ্রমিক মৃত্যুর ক্ষেত্রে মিল কর্তৃপক্ষ তার সমস্ত দায় ঝেড়ে ফেলে দিতে সচেষ্ট হয়। আর দুঃখের বিষয় প্রথাগত ট্রেড ইউনিয়ন এ বিষয়ে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে, বিশেষ করে শাসক দল নিয়ন্ত্রিত ট্রেড ইউনিয়নের মৌনতা ছিল লক্ষ্য করার মত। বড় জোর তাঁরা শ্রমিক পরিবারের জন্য সাময়িক কিছু ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা বলে নিজেদের দায় ঝেড়ে ফেলে।

২. এই নতুন কোডে বলা হয়েছে শ্রমিক নিজে তাঁর কাজের জায়গায় সুরক্ষার দিকে নজর দেবে। এখন প্রশ্ন কোনও শ্রমিক যদি কাজ করতে গিয়ে বলে উপযুক্ত সুরক্ষা নেই তাহলে সেই শ্রমিক কি আর কাজ পাবে? যেখানে চটকলের মত শিল্পে আকছার লক আউট, ক্লোজার, চাহিদার ঘাটতির নামে মিলে শিফট আওয়ার কমানোর দরুন অহরহ শ্রমিক ছাঁটাই বর্তমানে নিত্য দিনের ঘটনা। সেখানে শ্রমিকের পক্ষে উপযুক্ত সুরক্ষা নেই বলার ক্ষমতা কতটুকু থাকবে তা সহজেই অনুমান করা যায়।

৩. পেশাজনিত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষার ক্ষেত্রে *ন্যাশনাল অকুপেশনাল সেফটি অ্যান্ড হেলথ অ্যাডভাইসারি বোর্ড* তৈরি হবে কেন্দ্রীয় সরকারের এই সংক্রান্ত সংস্থার আমলা ও কর্মকর্তাদের নিয়ে। মালিকপক্ষ ও শ্রমিকপক্ষ থেকে পাঁচজন করে প্রতিনিধিকে এই বোর্ডের জন্য মনোনীত করবে সরকার নিজে। নতুন কোড অনুসারে শ্রমিক প্রতিনিধিদের যেহেতু সরকার মনোনীত করবে তাই এই বোর্ডের কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ থাকবে সরকারের হাতে। অথচ সরকারের মনোভাব খুব স্পষ্ট, তারা কর্মসংস্কৃতির নামে মালিকের মুনাফাকেই সুনিশ্চিত করতে চায়। সেখানে শ্রমিকদের প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা কতটা নিশ্চিত হবে তা উপরের ঘটনাগুলি থেকে খুব স্পষ্ট।

৪. সরকার ঠিক করে দেবে কোন ধরনের সংস্থায় সেফটি কমিটি থাকবে আর কোন ধরনের সংস্থায় থাকবে না। তার ফলে সব সংস্থা সেফটি কমিটি রাখার আইনি বাধ্যতা থেকে ছাড় পেল। যতই বিপজ্জনক সংস্থা হোক না কেন সেই সংস্থার মালিক সরকারকে প্রভাবিত করে সেফটি কমিটি তৈরি করবে না এটাই স্বাভাবিক।

চটকলের মত শিল্পে আগেভাগেই এই প্রবণতা ছিল ব্যাপক, এখন তা আইনি বৈধতা পাওয়ার পর পরিস্থিতি যে আরও সঙ্গীন হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

৫. যে সমস্ত সংস্থায় সেফটি অফিসার নিয়োগ হবে সেগুলি হল- (ক) যে ফ্যাক্টরিতে ৫০০ জনের বেশি শ্রমিক কাজ করে, (খ) যে ফ্যাক্টরিতে বিপজ্জনক কাজে ২৫০ জন বা তাঁর বেশি শ্রমিক কাজ করে, (গ) বিল্ডিং ও নির্মাণ কাজে যেখানে ২৫০ জন বা তাঁর বেশি শ্রমিক কাজ করে, (ঘ) যে সমস্ত খনিতে ১০০ জন বা তার বেশি লোক কাজ করে। এর ফলে সরকার বেশিরভাগ মালিকপক্ষকে সেফটি অফিসার নিয়োগ থেকে মুক্তি দিল।

এক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য যে, শিল্প শ্রমিক আইনকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য ইতিপূর্বে চটকল মালিকরা একাধিক পন্থা অবলম্বন করতে শুরু করেছিল, যার মধ্যে অন্যতম ছিল চটকলের সামগ্রিক উৎপাদন একটি ছাদের তলায় না করে, চট উৎপাদনের ভিন্ন প্রক্রিয়াকে পৃথক পৃথক জায়গায় প্রসেস করে চট উৎপাদনের প্রক্রিয়াকে সম্পন্ন করা। এর ফলে ফ্যাক্টরি আইনের একাধিক ক্রজকে চটকল মালিকরা বুড়ো আঙুল দেখিয়ে শ্রমিকদের উপর শোষণের মাত্রা বহুগুণ বাড়িয়ে তুলেছিল। উপরোক্ত আইন মালিকদের হাত আরও শক্ত করবে এবং শ্রমিক স্বাস্থ্য ও কাজের পরিবেশ আরও অধোগতি হবে তা সহজেই অনুমেয়।

৬. এই কোডের ষষ্ঠ অধ্যায়ে শ্রমিক কল্যাণের বিষয়ে কিছু নির্দিষ্ট বিষয়ের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু তা না মানলে মালিক বা নিয়োগকর্তার শাস্তি হবে কি না তা বলা হয়নি। শ্রমিক কল্যাণের

বিষয়ের মধ্যে পড়ে কোনও সংস্থার স্বাস্থ্য সুরক্ষা, কাজের পরিবেশ সংক্রান্ত উপযুক্ত ব্যবস্থা। যেমন- বায়ু চলাচল, পানীয় জল, আলো, ড্রেন ইত্যাদি। কিন্তু মালিক যদি তার সংস্থাতে এসবের যথাযথ ব্যবস্থা না করে তাহলেও ছাড় পেয়ে যাবে। তাছাড়া সেই ব্রিটিশ যুগেও সরকারের পক্ষ থেকে মালিকদের শ্রমিক কল্যাণের জন্য নির্দিষ্ট বিষয় উপদেশ হিসাবে বলা হত এবং আমারা দেখেছি সেই সময়ও মিল মালিকরা শ্রমিক স্বার্থে কল্যাণমূলক এই বিষয়গুলি না মানলেও তাদের প্রতি কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হত না। শ্রম কোডের এই অধ্যায় ব্রিটিশদের অনুকরণেই লিপিবদ্ধ হয়েছে তা অনুমান করলে ভুল হবে না। বস্তুত সরকার তার সমস্ত দায় ঝেড়ে ফেলতে উদ্যত, পক্ষান্তরে শ্রমিক কল্যাণের সমস্ত দায় মালিকদের উপর ঝেড়ে ফেলে দিয়েই তারা ক্ষান্ত, তা যথাযথ প্রয়োগ হল কি না তা দেখার মত দায়ও সরকার নিজে নিতে প্রস্তুত নয়। এমতাবস্থায় শ্রমিকদের অবস্থা আরও করুণ হতে চলেছে তা সহজে অনুমান করা যায়।

৭. কোন শিল্প সংস্থায় স্বাস্থ্য ও সুরক্ষার বিধি মালিক ঠিকমত পালন করছে কি না তা তদন্ত করার ভার যার উপর ছিল তাকে পুরানো আইনে 'ইন্সপেক্টর' বলা হত। এই কোডে তার নাম 'ইন্সপেক্টর কাম ফ্যাসিলিটেটর' রাখা হয়েছে। এদের ক্ষমতা আগের তুলনায় অনেক কমে গেছে। বাস্তবে সে মালিকপক্ষের বিশ্বস্ত কর্মচারীতে পরিণত হয়েছে। ফলে শ্রমিকদের উপর মালিকদের শোষণ ও অত্যাচারের মাত্রা যে আরও বৃদ্ধি পাবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

৮. পূর্বে ফ্যাক্টরি আইনে শ্রম ইন্সপেক্টর যেকোনো সময় ফ্যাক্টরিতে পরিদর্শনে আসতে পারত। কিন্তু নতুন আইনে তাঁকে আগাম নোটিশ করে সংশ্লিষ্ট ফ্যাক্টরিতে যেতে পারে। ফলে চটকল মালিকদের উপর সরকারী নজরদারির বাঁধন অনেকটাই আলগা হয়ে পড়ল। এতে সামগ্রিকভাবে শিল্পক্ষেত্রে শ্রমিকদের কাজের পরিবেশ বেশ প্রভাবিত হবে তা সহজে অনুমান করা যায়।

৯. সরকার চিহ্নিত করবে কোনও শিল্প সংস্থা বিপজ্জনক কি না এবং সেখানে মেডিক্যাল অফিসার নিয়োগ হবে কি না তাও ঠিক করে দেবে সরকার। আমরা জানি যে কোন শিল্প সংস্থার কাজকর্ম সেই সংস্থার শ্রমিক বা তার আশেপাশের মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। নতুন আইনে শ্রমিক স্বার্থে সব সংস্থায় মেডিক্যাল অফিসার নিয়োগের বাধ্যতা আর থাকল না।

দীর্ঘদিন ধরেই চটকলগুলিতে ডিস্পেন্সারি ও একজন মেডিক্যাল অফিসার থাকার নিয়ম ছিল, এমনকি বাম আমলের প্রথম দেড়- দু দশক পর্যন্তও এই প্রথা বহাল ছিল। মিলের বাইরে ই.এস.আই. প্যানেলভুক্ত ডাক্তার ছিল যেখানে শ্রমজীবীরা সপরিবারে চিকিৎসা করাতে পারত, তার পাশাপাশি ছিল ই.এস.আই. হাসপাতাল। কিন্তু বাম আমলের শেষের দিক থেকেই এই ব্যবস্থা ক্রমশ নড়বড়ে হতে শুরু করে। বিশেষত, চট শিল্পের রুগ্নতার নাম করে চটকলের মালিকরা ক্রমশ লকআউট, ক্লোজার, ছাঁটাই ইত্যাদির মত অস্ত্র প্রয়োগ করার মধ্য দিয়ে শ্রমিকদের বাধ্য করে তাদের মনমর্জি নিয়মে চটকলে কাজ করাতে। ফলে স্থায়ী শ্রমিকের সংখ্যা ক্রমশ কমতে থাকে এবং মালিক শ্রেণি অস্থায়ী শ্রমিক যথা-

বদলি, স্পেশাল বদলি, ভাগাওয়ালা, ট্রেনী, ক্যাজুয়াল, কন্ট্রাকচুয়াল ইত্যাদি নামে নানা ধরনের শ্রমিক এর ক্রমশ আত্মপ্রকাশ ঘটতে শুরু করে। এরা চটকলে শ্রমিক রূপে কাজ করলেও, স্থায়ী শ্রমিকের প্রাপ্ত কোন অধিকারই তারা পায় না, পি.এফ., গ্রাচ্যুইটি ইত্যাদির পাশাপাশি ই.এস.আই. এর মত গুরুত্বপূর্ণ শ্রমিক অধিকার থেকেও তারা বঞ্চিত থাকে।[৫] শুধু তাই নয়, যাঁরা এই অধিকার কম বেশি পায় তাঁরাও মিলে লক আউট, ক্লোজার, ওয়ার্ক সাস্পেনশন ইত্যাদি ফলে কর্মদিবস নষ্ট হওয়ায় ই.এস.আই. পরিষেবা পাওয়ার জন্য যে নির্ধারিত চাঁদা দিতে হয় তা দিতে অপারগ হওয়ায় ই.এস.আই. সুবিধা থেকে বঞ্চিত থাকতে বাধ্য হয়।

বস্তুত করোনা মহামারীর (২০২০-২১) সময় শ্রমজীবীদের জন্য পাওয়া ই.এস.আই. সুবিধার দৈন্য অবস্থা সর্বসম্মুখে এসে পড়ে। মহামারী চলাকালীন যাবতীয় চিকিৎসা সুবিধা থেকে শ্রমজীবীরা বঞ্চিত হয়েছিল। মিল চলাকালীন শ্রমিকদের বেতনের একটি নির্দিষ্ট অংশ ই.এস.আই. এর জন্য কেটে নেওয়া হয়, যা চাঁদা নামেই বহুল প্রচলিত। শারীরিক অসুস্থতার সময় শ্রমজীবীদের ই.এস.আই. থেকে চিকিৎসা পাওয়ার কথা, কিন্তু শ্রমজীবীরা তাদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত থেকে যায়। চটশিল্পের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হচ্ছে শ্রমজীবীরা, তাই তাদের স্বাস্থ্য অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত। অথচ মিলে লক-আউট বা ওয়ার্ক সাস্পেনশনের দরুন শ্রমজীবীরা দীর্ঘদিন ই.এস.আই. এর নির্ধারিত টাকা জামা দিতে অসমর্থ হয়, যেটার জন্য তারা মোটেও দায়ী নয়। এমতাবস্থায় মিল মালিক নিজ স্বার্থে মিল বন্ধ করলে শ্রমিকরা যাতে ই.এস.আই. এর

সুবিধা থেকে বঞ্চিত না হয় সে বিষয়ে আইনানুগ পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি। ই.এস.আই. এর সুবিধাকে আরও স্বচ্ছ ও কার্যকর করা উচিত। ই.এস.আই. এর বিভিন্ন জটিল প্রক্রিয়াকে সরল করে শ্রমিকদের আওয়তার মধ্যে নিয়ে আসতে হবে। পাশাপাশি যদি কোন মিল সম্পূর্ণ বন্ধ ঘোষণা করা হলে সেই মিলের শ্রমিকদের যাবতীয় পাওনাগণ্ডা পরিশোধ করার, পাশাপাশি তাদের ই.এস.আই পরিষেবা পাওয়া নিশ্চিত করতে হবে। অথচ বর্তমান শ্রমকোডে ঠিক এর বিপরীত অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার এই আইনের ফলাও প্রচার চালালেও, এটা বুঝতে অসুবিধে হয় না যে, চটকলের শ্রমিকদের পেশাগত সুরক্ষা, স্বাস্থ্য ও কাজের পরিবেশের ক্ষেত্রে বাম আমলের শেষ দশক থেকে যে অব্যবস্থা ক্রমশ উদ্ভব হয় এবং বিগত দেড় দশকে এক্ষেত্রে যে চরম অধোগতি ঘটে সেটাকে আইনী বৈধতা দেওয়াই এই নতুন শ্রম কোডের মূল উদ্দেশ্য।

১০. কাজের ঘন্টার বিষয়টি এমনভাবে কোডে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যাতে কোন শ্রমিককে সংস্থার চত্বরে ৮ ঘন্টার বেশি রেখে দেওয়ার ক্ষেত্রে সমস্ত সংস্থার মালিক ও নিয়োগকর্তা বিশেষ ছাড় পাবে। তার ফলে টিফিন, বিশ্রাম ইত্যাদির উপর রাশ টেনে কাজের ঘণ্টা বাড়ানো মালিকের পক্ষে সহজ হয়ে যাবে।

চটকলের মত শ্রমসাধ্য কাজে ৮ ঘণ্টার বেশি কাজ করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। সেক্ষেত্রে উপরোক্ত আইন চটকল মালিকদের শ্রমিক শোষণের পথ যে আরও প্রশস্ত করল তাতে সন্দেহ নেই। আলোচনার প্রথমেই চটকলে দুই শ্রমিকের মৃত্যুর ঘটনা থেকে

আমার বক্তব্য শুরু করেছিলাম, যেখানে দেখা যায় পরবেশ সিং অসুস্থ বোধ করলে, মেশিনের পাশেই চটের বস্তা বিছিয়ে আরাম করার চেষ্টা করে, এই চটকলগুলিতে শ্রমিকদের সামান্যতম রেস্ট করার জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা যে একেবারেই নেই তা বিভিন্ন মিলগুলি ঘুরে দেখলেই বোঝা যায়। তার উপর কাজের অত্যাধিক চাপ যে তাদের স্বাস্থ্য ভেঙ্গে ফেলবে তা সহজেই অনুমেয়।

বস্তুত এই শ্রমকোড যতটা না শ্রমিকদের স্বাস্থ্য তার থেকে অনেক বেশি মালিকদের হাত শক্ত করার কাজে লাগবে। এই অবস্থায় শ্রমিক স্বার্থ রক্ষার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধ আবশ্যক। কিন্তু বর্তমানে চটকল ট্রেড ইউনিয়নগুলি বড্ড বেশি নিয়মতান্ত্রিক যন্ত্রে পরিণত হয়ে পড়েছে। তিন বছর অন্তর নিয়মতান্ত্রিক ত্রিপাক্ষিক চুক্তিই তাদের পাখির চোখে পরিণত হয়েছে। অথচ বর্তমান পরিস্থিতি সেই ব্রিটিশ আমল থেকেও ভয়াবহ। তাদের এই পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে এক বৃহত্তর শ্রমিক সংহতি তৈরি করে তাঁদের সংগ্রামে অবতীর্ণ করার কোনও প্রয়াস ট্রেড ইউনিয়নগুলির মধ্যে লক্ষ্য করা যায় না। বস্তুত ট্রেড ইউনিয়নগুলি বহুধা স্বার্থে বিভক্ত, পাশাপাশি এই ট্রেড ইউনিয়নের উপর শ্রমিকদের আস্থাতেও চিড় ধরেছে। যার সামগ্রিক লাভ তুলছে চটকল মালিক শ্রেণি। পক্ষান্তরে সরকার নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে।

সূত্র নির্দেশ

১. ঘটনাটির বিস্তারিত বিবরণ পাই সেই মিলেরই কর্মরত দুই শ্রমিক ভরত কাহার ও রমেশ চৌধুরীর কাছ থেকে, ৮ই ফেব্রুয়ারী, ২০২৩।

২. বিজয় যাদব, শ্রমিক নেতা, আই.এন.টি.ইউ.সি., গৌরিশঙ্কর জুট মিল।

৩. N24news এর দ্বারা সংবাদটি পরিবেশিত হয় ৪ঠা আগস্ট।

৪. সুমন কল্যাণ মৌলিক, *শ্রমকোড ২০২০*, বহুবচন প্রকাশনী, হালিশহর, ১লা মে, ২০২২।

৫. ফেডারাল চটকল ইউনিয়ন, ষোড়শ সম্মেলন, চাঁপদানী, হুগলী, ২লা অক্টোবর, ২০২৩, পৃষ্ঠা- ৯।